গৌরাঙ্গ নন্দী
হাসান মেহেদী

ব্যবসায়ীদের থাবায় প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনস্

সিএসআরএল-এর আওতায় এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক প্রতিবেদন

Uttaran
ক্যাম্পেইন লীড

কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপ
ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড–সিএসআরএল

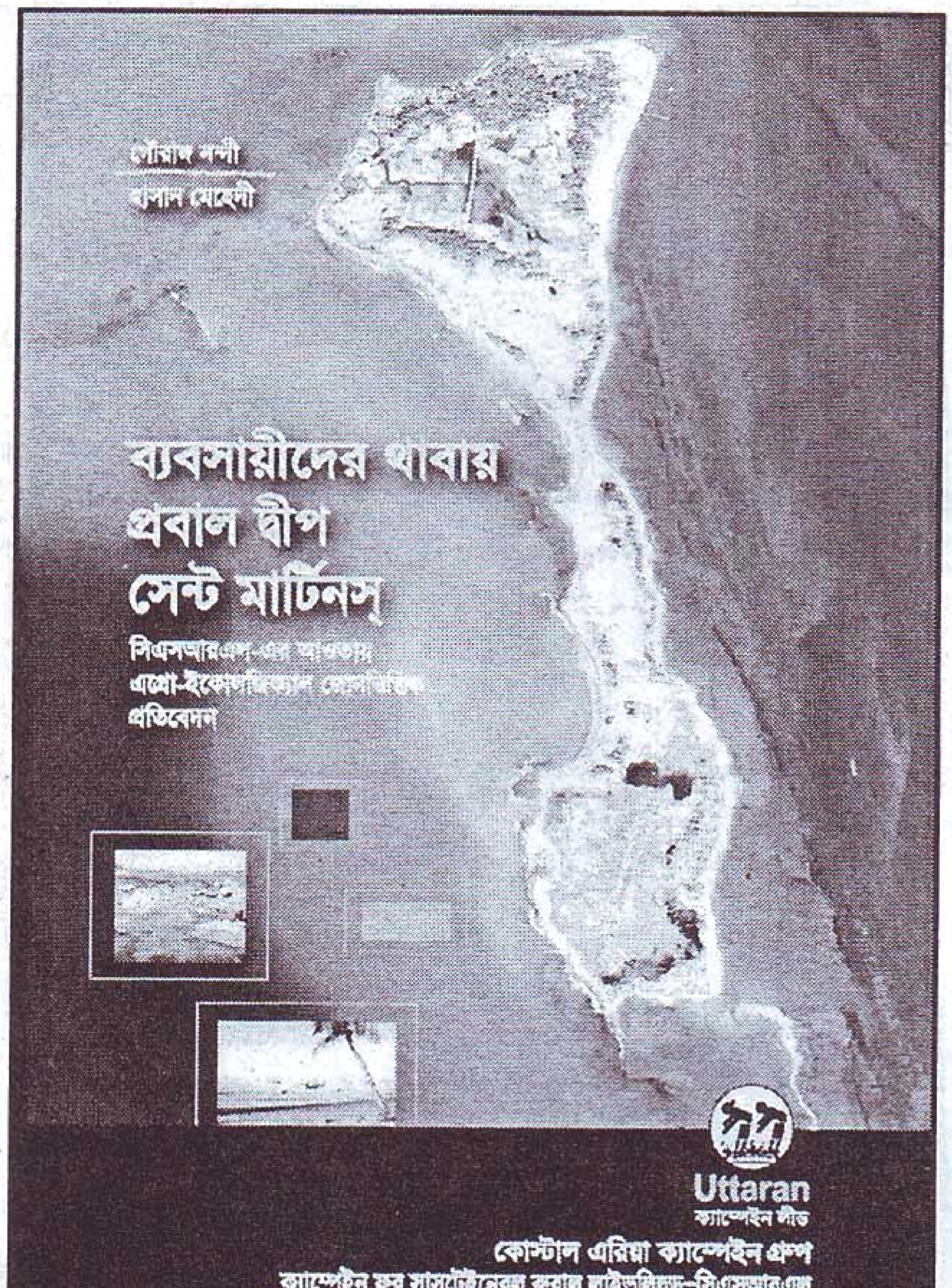
গৌরাঙ্গ নন্দী
হাসান মেহেদী
ব্যবসায়ীদের থাবায়
প্রবাল দ্বীপ
সেন্ট মার্টিনস্
সিএসআরএল-এর আওতায়
এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক
প্রতিবেদন
Uttaran
ক্যাম্পেইন লীড
কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপ
ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড-সিএসআরএল

ব্যবসায়ীদের থাবায় প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনস্

সিএসআরএল-এর আওতায়
এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক
প্রতিবেদন

গৌরাঙ্গ নন্দী
হাসান মেহেদী

Uttaran

উত্তরণ

লীড, কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপ
ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড–সিএসআরএল

সার্বিক নির্দেশনা
শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

পরামর্শ
জিয়াউল হক মুক্তা, পলিসি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার, অক্সফ্যাম
খালিদ হোসেন, পলিসি অফিসার, অক্সফাম

জানুয়ারি ২০০৯

যোগাযোগ
উত্তরণ
আঞ্চলিক কার্যালয়
বাড়ি # ২০৫, সড়ক # ০৮
সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকা
খুলনা-৯১০০
uttaran@bdonline.com
gouranga.nandy@gmail.com

মুদ্রণে
রবি প্রিন্টিং প্রেস
শান্তিধাম মোড়, খুলনা।
ফোন : ০৪১-৮১০৬৯৪
rabipress@btcl.net.bd

পরিচালকের কথা

সিএসআরএল'র কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপের আওতায় চারটি এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনের আওতায় চারটি কেস-স্টাডি তৈরি করা হয়। এর মধ্যে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপাঞ্চল নিয়েও একটি কেস-স্টাডি তৈরি হয়। উত্তরণ এই কেস-স্টাডিটি তৈরি করে। উত্তরণ-এর পক্ষে গৌরাঙ্গ নন্দী এই কেস-স্টাডিটি তৈরি করেছেন। তাকে সহযোগিতা করেছেন হাসান মেহেদী। আর গোটা কাজটির পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন অক্সফাম জিবি'র জিয়াউল হক মুক্তা এবং খালিদ হোসেন।

এই কেস-স্টাডিটি আমাদেরকে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপাঞ্চলকে বুঝতে সহায়তা করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। পাশাপাশি এর তথ্য-উপাত্ত চলমান প্রচারণা কর্মসূচিকে সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস। আমি এই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ
ও
লিড, কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপ
সিএসআরএল

সূচি

প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ	০৭
পটভূমি	**০৯**
কেস-স্টাডির উদ্দেশ্য	**০৯**
পদ্ধতি	**১০**
এলাকার পরিচিতি	**১১**
দ্বীপের জীববৈচিত্র্য	**১১**
জীবনযাত্রা	**১২**
• বসতি	১২
• কৃষি	১৩
• আয়/পেশা	১৩
• স্বাস্থ্য	১৫
• শিক্ষা	১৫
• বিনোদন	১৬
• নিরাপত্তা	১৬
আধুনিক ব্যবসা	**১৬**
জীবন-জীবিকায় হুমকি	**১৭**
দ্বীপবাসীদের বাজারে প্রবেশাধিকার/অধিগম্যতা	**২০**
দ্বীপের সমস্যাবলী কি সাধারণের সমস্যা	**২১**
প্রচারণা কর্মসূচির ভূমিকা	**২২**
শেষ কথা	**২৩**
• **তথ্যপঞ্জী**	**২৪**

প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনস্ আজ নানা কারণে আলোচিত। বিশেষতঃ বেসরকারি উদ্যোগে এই এলাকাটিকে একটি ব্যবসা-সফল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টায় এর অস্তিত্ব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) বা ইসিএ হিসেবে ঘোষিত। সেই হিসেবে এটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব অনেক বেশি। এটি একটি স্বতন্ত্র এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনও বটে।

সিএসআরএল-এর দীর্ঘমেয়াদী প্রচারণা কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হিসেবে এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক কেস-স্টাডির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের একটি একক এগ্রো-ইকোলোজিক্যাল জোন হিসেবে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের অবস্থা এলাকাবাসীর অবস্থান থেকে পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই এলাকাটি কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রুপের ইস্যু হচ্ছে *একসেস টু কমোন প্রোপার্টি* বা সাধারণ সম্পদে প্রবেশাধিকার দাও। সাধারণের এই অধিকারবোধের দিক থেকে প্রবাল দ্বীপটির বর্তমান অবস্থা, সঙ্কট ও সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তনকে দেখার জন্যেই এই কেস-স্টাডি।

এই দ্বীপবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস সমুদ্রে মাছ ধরা। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস কৃষি। দ্বীপটি একেবারেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভৌগোলিক কারণে এখানকার বাসিন্দারা রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত; অবশ্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সকল সুবিধা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা যে আছে তেমনও নয়। সাম্প্রতিককালে এই দ্বীপের ওপর মানুষের নজর-আগ্রহ অনেক বেশি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী ধ্বংস হতে চলেছে। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, স্বাদু পানির সংকট, অতিরিক্ত টাইডাল সার্জ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রধান। আর বাণিজ্যিক হস্তক্ষেপে চলছে অপরিণামদর্শী মৎস্য আহরণ, পানি দূষণ, মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ ও পাথর এবং প্রবাল সংগ্রহ। এসব কারণে বালিয়ারি কেয়াবন, প্যারাবন ও ঝোপঝাড় ধ্বংস হচ্ছে। দ্বীপের কাছিম, লাল কাঁকড়াসহ অসংখ্য জীবকুল প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে।

তাছাড়া সমুদ্র সৈকতে মানুষের অবাধ বিচরণ, বিভিন্ন প্রাণীর অবৈধ আহরণ, অপরিকল্পিতভাবে যেখানে-সেখানে নোঙর করা প্রভৃতি কারণগুলো বিশেষ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই অঞ্চলটির সঙ্গে সাযুজ্য নয়।

দ্বীপবাসীরা ক্ষমতা-কাঠামোর একেবারে নিচের স্তরে বাস করেন। বাজারে এদের একেবারেই প্রবেশাধিকার নেই। দ্বীপের প্রধান পেশাজীবী গোষ্ঠী–জেলেরা বলতে গেলে একেবারে বন্ডেড শ্রমিক। এই জেলে-শ্রমিকদের পাওনার টাকা হিসাব করা হয়, প্রাপ্ত মাছ বিক্রির অর্থ থেকে। মাছ বিক্রি করেন সাধারণতঃ ট্রলার মালিক। তিনি বিক্রির টাকা যা হিসাব করেন, সেই হিসাবে জেলে-শ্রমিকরা ভাগ পেয়ে থাকেন। এতে ট্রলার ও জালের মালিক শ্রমজীবী জেলেদের ঠকানোর সুযোগ পান। জেলে-শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত ঠকেও থাকে। উৎপাদিত কৃষি-পণ্যের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিপত্তি ঘটে।

দ্বীপবাসীরা এখন সেখানকার সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছে। সম্পদের মালিকানা যাচ্ছে বহিরাগত ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের কাছে। ব্যবসায়ীদের থাবায় দ্বীপবাসীরা জমি হারিয়ে ভূমিহীন শ্রমজীবীতে পরিণত হচ্ছে। বহিরাগত ব্যবসায়ীরা হচ্ছে পরাক্রমশালী দাপুটে, আর দ্বীপবাসীরা একদল অভাবী জনগোষ্ঠী। দ্বীপের কৃষি কর্মকাণ্ডগুলো ক্রমে সঙ্কুচিত হচ্ছে। দ্বীপকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার ব্যক্তি উদ্যোগ যথেষ্ঠ পরিমাণে বাড়ছে। যেকারণে বিশাল বিশাল স্থাপনা গড়ে উঠছে। অবশ্য দ্বীপটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নেই। এখানে পানীয়-জলসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। গড়ে ওঠেনি স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটেশন ব্যবস্থা। উপরন্তু দ্বীপটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আরও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়েছে।

প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের ভূ-সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির হলেও প্রতিবেশগত বিবেচনায় এটি রাষ্ট্রের বা সাধারণের সম্পত্তি। প্রতিবেশগত বিবেচনায় এটিকে রক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তির ইচ্ছায় এটিকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিত হবে না। এই সাধারণ সম্পত্তিটি রক্ষায় আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের সর্বশেষ জনবসতিটি হচ্ছে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপ। এটি দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। অনন্য জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি বাংলাদেশের একটি একক এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) বা ইসিএ হিসেবে ঘোষিত।

বাংলাদেশের এই প্রবাল দ্বীপটির কথা সাম্প্রতিককালে বেশ প্রচারিত ও আলোচিত। প্রধানতঃ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে সৌন্দর্যপিপাসুরা সেখানে ছুটে যান। যেহেতু এটি দ্বীপ, যেতে হয় নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের একটি অংশ পাড়ি দিয়ে, সেকারণে বছরের যেকোন সময় সেখানে পর্যটকরা যেতে পারেন না। ওই দ্বীপে সবসময় যাওয়ার জন্যে রয়েছে দেশী যন্ত্রচালিত নৌকা। যাতে করে স্থানীয় অধিবাসী এবং দ্বীপবাসীরা স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারেন; কিন্তু অন্যরা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ভেঙ্গে দেশী নৌকায় চলাচলে সাহস দেখাতে চান না। সেই কারণে পর্যটকদের জন্যে রয়েছে সি-ট্রাক। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় বা নবেম্বরের শুরু থেকেই এই সি-ট্রাকগুলো চলাচল শুরু করে মার্চের শেষ বা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মোটামুটি বছরের পাঁচ থেকে ছয় মাস কমবেশি পর্যটকদের চাপে এবং এর ব্যবসায়িক দিকটিকে প্রধান করে দেখায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই ক্ষেত্রটি বেশ চাপের মুখে পড়েছে, যা সাধারণভাবে কেউ আশা করে না।

কেস-স্টাডির উদ্দেশ্য

সিএসআরএল-এর দীর্ঘমেয়াদী প্রচারণা কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হিসেবে এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক কেস-স্টাডির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের একটি একক এগ্রোইকোলজিক্যাল জোন হিসেবে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের অবস্থা ও অবস্থান জানা-বোঝা ও পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি হয়। আবার এটি কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রুপের ইস্যু হচ্ছে *একসেস টু কমোন প্রোপার্টি* বা সাধারণ সম্পদে প্রবেশাধিকার দাও। সাধারণের এই অধিকারবোধের দিক থেকে প্রবাল দ্বীপটির বর্তমান অবস্থা, সঙ্কট ও সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তন কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তা খুঁজে পেতেই এই কেস-স্টাডি। এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে :

- গ্রুপের ইস্যুভিত্তিক (সাধারণ সম্পদে প্রবেশাধিকার দাও) প্রচারণার বিষয়টি সম্পর্কে এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণ (Power

Analysis) করা ও বাজার কাঠামো বিশ্লেষণ (Market Chain Analysis) করা;

- ক্যাম্পেইনের ঝুঁকি ও সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা;
- চিহ্নিত ইস্যুটি কি মাত্রায় গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে প্রভাব ফেলছে তা নিরুপণ তথা যাচাই-বাছাইয়ের চেষ্টা করা; প্রভৃতি।

পদ্ধতি

কেস-স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য নানা উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। যদিও এটি শুদ্ধ গবেষণা নয়; তবুও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস ছাড়াও বিশেষভাবে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

প্রাথমিক উৎস :

- নির্বাচিত জনগোষ্ঠী ও পেশাজীবী গ্রুপের প্রতিনিধি ও মূল তথ্যদাতা/দের মতামতভিত্তিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা;
- ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের (এফজিডি'র) মাধ্যমে নির্বাচিত জনগোষ্ঠী ও পেশাজীবী গ্রুপের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা এবং
- স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত যাচাই করা।

মাধ্যমিক উৎস :

- ইস্যুসংশ্লিষ্ট ও অঞ্চলভিত্তিক পূর্বের গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং
- বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশনা পর্যালোচনা করা।

বিশেষ বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

তথ্য সংগ্রহের সময় নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়সমূহ বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। উপরন্তু এলাকাবাসীর জীবন-জীবিকা এবং সাধারণ সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কি, তা বিশেষভাবে বিবেচনা রাখা হয়েছে।

এলাকার পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের শেষ ভূমি বসতিটি হচ্ছে টেকনাফ উপজেলা। এই উপজেলার একটি ইউনিয়ন সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপ। টেকনাফের বদর মোকাম হতে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে দ্বীপটির অবস্থান। এর আয়তন ৫৯০ হেক্টর। দৈর্ঘ্যে প্রায় আট কিলোমিটার। দ্বীপটি অনেকটা ডাম্বেল আকৃতির। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এর প্রধান দু'টি অংশ–উত্তর পাড়া ও দক্ষিণ পাড়া। মাঝখানের চিকন-সংকীর্ণ একটি অংশের নাম গলাচিপা। এর একেবারে দক্ষিণে রয়েছে ছেড়াদিয়া বা ছেড়াদ্বীপ। এই অংশটি জোয়ারের সময় মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনটি খুব ছোট দ্বীপের রূপ ধারণ করে।

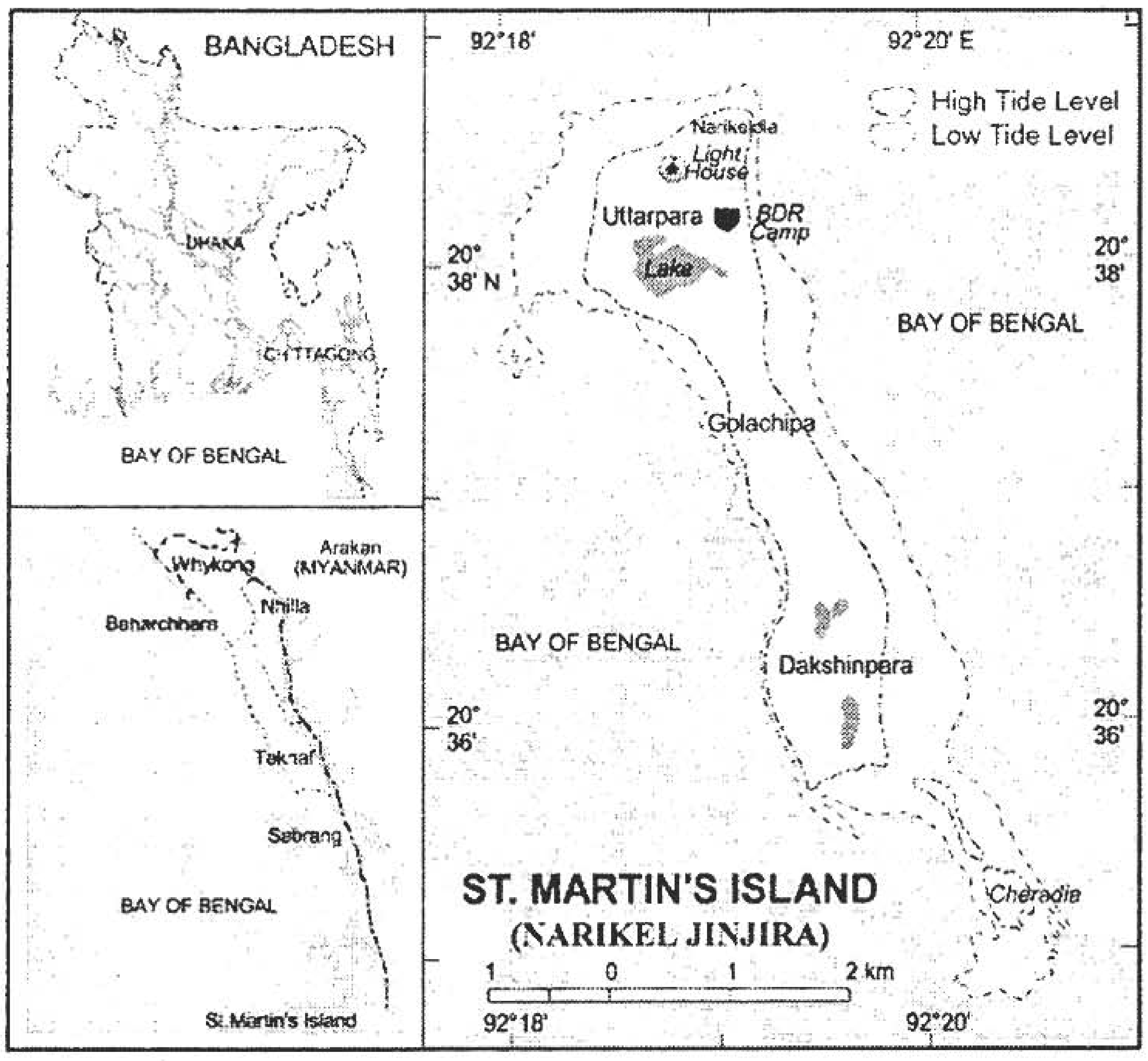

দ্বীপের জীববৈচিত্র্য

দ্বীপটি প্রধানতঃ প্রবালের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র প্রবাল নয়, আছে আরও নানান প্রজাতির জীব। এই দ্বীপে ১৫৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ১৫৭ প্রজাতির স্থলজ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ, ৬৬ প্রজাতির প্রবাল, ১৮৭ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ২৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ; যার মধ্যে ৮৬টি প্রজাতি প্রবাল আশ্রিত, চার প্রজাতির উভচর, ৬৭ প্রজাতির স্থানীয় পাখি ও ৫৩ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিসহ মোট ১২০ প্রজাতির পাখি, ২৯ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪ প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ মোট ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপস্থিতি রয়েছে।

দ্বীপের ভাটার নিম্নবর্তী (Sub-tidal) পাথরময় অঞ্চল হতে সাগরের তলদেশে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত বিচিত্র প্রজাতির প্রবাল জন্মে থাকে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে স্পঞ্জ, শিল কাঁকড়া, সন্ন্যাসী কাঁকড়া, লবস্টার, কস্তুরা, শঙ্খ শামুক, সমুদ্র শশা ইত্যাদি এবং পরী মাছ, প্রজাপতি মাছ, বোল করাল, নাক কোরাল, রাঙ্গা কৈ, সুঁই মাছ, লাল মাছ, উড়ুক্কু মাছ, খরগোস মাছ, সজারু মাছ ও মোরে ইল ইত্যাদি মাছের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বীপের বালুচর বৈশ্বিকভাবে বিপন্ন গ্রিন টার্টল ও অলিভ রিডলে টার্টল নামক দুই প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিমের ডিম পাড়ার আদর্শ স্থান।

সেন্ট মার্টিনের পাশের সমুদ্র এলাকায় দুই প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী বিচরণ করে। তাছাড়া দ্বীপের অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীববৈচিত্র্য উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কেয়া, শ্যাওড়া, সাগর লতা, ক্ষুদ্রাকৃতির বিরল জাতের পিঁয়াজ এবং উচ্চমাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল বাইন গাছ।

জীবনযাত্রা

সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপে বসবাসকারীদের প্রধান পেশা সাগরে মাছ ধরা। প্রকৃতপক্ষে জেলে, জেলে-জীবন এবং সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের বসতি এক ও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। দেড় শতাধিক বছর আগে মিয়ানমার (সাবেক বার্মা) সমুদ্রে মাছ ধরতে আসা একদল জেলে-ই এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। তাঁদের কয়েকজন সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে মানুষের বসতি। অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা সাগরে মাছ ধরা। সাধারণতঃ বর্ষার উত্তাল সময়ে ও এর আগে-পরে ছয় মাস সময় তারা সাগরের সঙ্গে লড়াই করে মাছ ধরেন। তবে সাম্প্রতিককালে এলাকাবাসীর প্রধান পেশার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাঁরা ঠিকমত সাগরে যেতে পারে না। আয়ের বিকল্প সুযোগও তাঁদের সামনে খুব একটা নেই।

এক নজরে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

জে এল নং	১২
ইউনিয়ন	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ
উপজেলা	টেকনাফ
জেলা	কক্সবাজার
পরিবার সংখ্যা	৮১৮টি
জনসংখ্যা	৫৭২৬ জন
গৃহাস্থলি	৫৬.৪ একর
আঙ্গিনায় সবজি বাগান	১৮.৩ একর
বাগান	২.১ একর
কৃষিজমি	২৮৬ একর
পুকুর	০.৬৫ একর
মাছ চাষের এলাকা	১২.৪ একর
মাছ প্রসেসিং এলাকা	১২.৩ একর
ব্যবসায়িক এলাকা	১৫.২ একর
খাল	১.২ একর
সড়ক	৯.৭ একর
চরভূমি	১৪৩.৩৯ একর
বিরাণ ভূমি	১৬৮.৪০ একর
খাসজমি	৮৫.৯ একর
সাইক্লোন শেল্টার	০.৮৬ একর
কবরস্থান	২ একর

বসতি

প্রবালের ওপর গড়ে ওঠা এই দ্বীপে এক হাজারের মত পরিবার তথা সাত হাজার জনবসতির স্থায়ী বসতি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দেড় শতাধিক বছর আগে মিয়ানমারের একদল মৎস্য শিকারি এই দ্বীপটির আবিষ্কারক। সেই সময় থেকে এখানে বসতির শুরু। ধীরে ধীরে বসতি বেড়েছে। শুধুমাত্র মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রা শুরু হলেও মানুষ এখানে কৃষিকাজ করার চেষ্টা করেন। গোটা দ্বীপের

মালিকানা ছিল এখানকার অধিবাসীদের। কিন্তু সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাসিন্দারা হোটেল-মোটেল ব্যবসায়ীদের কাছে জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। জমির বেশিরভাগ এখন স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে হাত-ছাড়া হয়েছে। বলাইবাহুল্য, জমিকে ঘিরে একসময় বসতি গড়ে উঠলেও আজ আর সেই অবস্থা নেই।

কৃষি

বসতির শুরু থেকেই মানুষ এখানকার ভূমিতে কৃষিকাজ করার চেষ্টা করেছে। এই দ্বীপে অল্প পরিমাণে হলেও ধান উৎপাদিত হয়। সাধারণতঃ উচ্চ ফলনশীল জাতের বিআর ৩১ ধানের চাষ হয়। এখানে ভালো তরমুজ ফলে। আরও উৎপাদিত হয় পিঁয়াজ, মরিচ, আলু প্রভৃতি। এখানকার কৃষকরাও সার, কীটনাশক ব্যবহার করেন। তবে দ্বীপে কোন কৃষি অফিস নেই। দ্বীপটি একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন হলেও এখানে কোন কৃষি কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন বলে দ্বীপবাসিন্দারা বলতে পারেননি।

আয়/পেশা

এখানকার অধিবাসীদের প্রথম এবং প্রধান পেশা সমুদ্রে মাছ ধরা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ কৃষিকাজ তথা কৃষি-শ্রমিক হিসেবে শ্রম বিক্রি করেন। সহজ কথায় দিন মজুরি বলাও চলে। তবে কাজের সুযোগ দ্বীপে খুব একটা নেই, একারণে তাদের টেকনাফ সদর বা অন্যান্য এলাকায় যেতে হয়। হাল আমলে একদল লোক পর্যটনকেন্দ্রিক নানা পেশা যেমন রিক্সা-ভ্যান চালানো, হোটেল-মোটেল-বাংলোয় বয়-বেয়ারা-নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে কাজ করে থাকেন। তবে বেশিরভাগ দ্বীপবাসীরই কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই। সেই বিবেচনায় তারা এক অনিশ্চিত জীবন যাপন করেন।

পুরুষদের পেশাভিত্তিক বিভাজন

ক্রমিক	পেশা	শতকরা হার
১	জেলে/মৎস্যজীবী	৩৮%
২	ভ্যানচালক	২৪%
৩	কৃষিমজুর/দিনমজুর	১৮%
৪	চাকরিজীবী	৯%
৫	বর্গাচাষি	৭%
৬	অন্যান্য	৪%

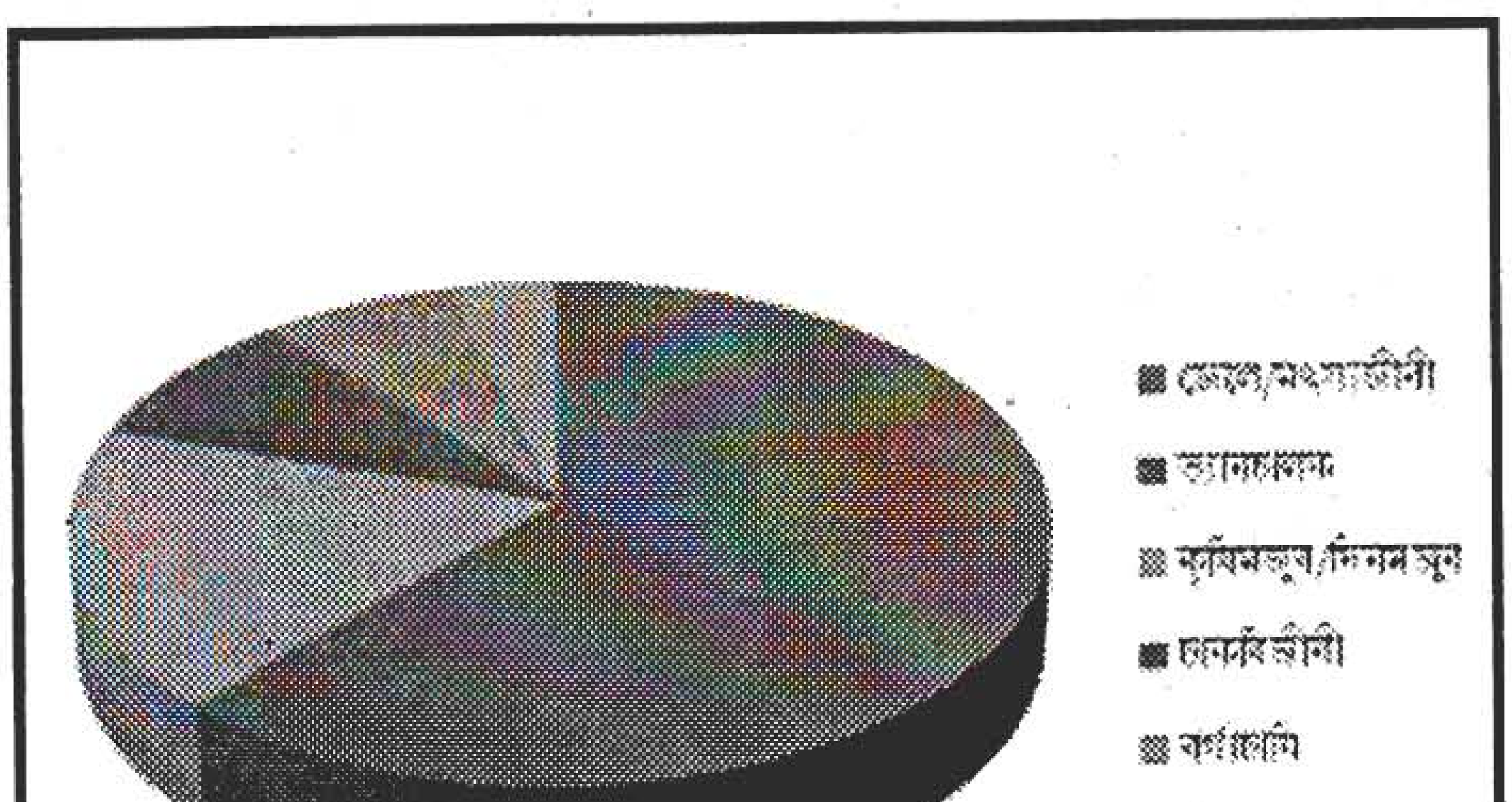

পুরুষেরা সারা বছরে ৯-১০ মাস সমুদ্রে মাছ ধরতে যান। আবহাওয়ার কারণে যখন মাছ ধরা সম্ভব না হয় তখন অধিকাংশ জেলে ভ্যান চালানো বা দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। চট্টগ্রাম বা কক্সবাজারের জেলেরা একবারে ৭-৮ দিনের জন্য সমুদ্রে গেলেও সেন্ট মার্টিনস্‌স্‌'র জেলেরা সর্বোচ্চ ১ দিনের জন্য সমুদ্রে মাছ ধরতে যান। প্রত্যেকটি ট্রলারের জন্য স্থানীয় প্রশাসন (উপজেলা/জেলা) থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। মাছ ধরার জন্য আলাদা কোনো পারমিট নিতে হয় না। প্রতিবারে ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকার মাছ পাওয়া যায়। এসব মাছ আড়াই ভাগের ১ ভাগ জেলেরা পায়।
সাধারণতঃ একটি ট্রলারে ৬ থেকে সাতজন জেলে থাকে।

নারীদের পেশাভিত্তিক বিভাজন

ক্রমিক	পেশা	শতকরা হার
১	গৃহিণী	৪৬%
২	গৃহ-পরিচারিকা	২৯%
৩	শুটকি পরিচর্যা	১৭%
৪	অন্যান্য	৮%

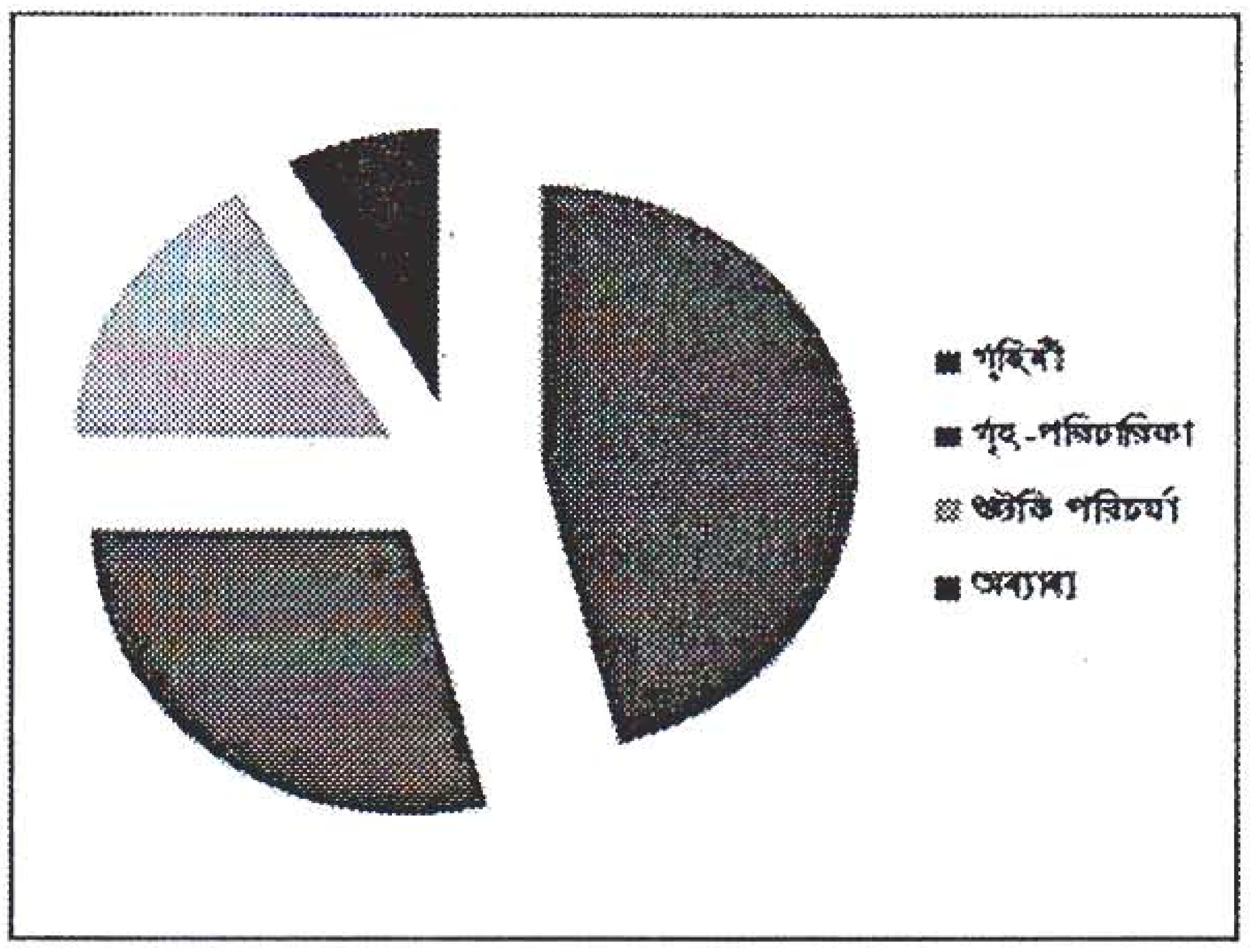

ক্রমবর্ধমান মাদ্রাসা নারীদের বাইরের কাজে অন্তর্ভুক্ত হবার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা।

সংসার প্রতিপালন বা জীবন-ধারণের প্রয়োজনে নারী-পুরুষ উভয়ে সুযোগ-সুবিধামত শ্রম দিলেও সম্পদের মালিকানা-কর্তৃত্বে নারীদের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। অধিকাংশ পরিবারে সীমিত যতটুকু সম্পদ রয়েছে তা বসতবাড়িকেন্দ্রিক। মাছ ধরার নৌকা-জাল মাত্র গুটিকয়েক পরিবারের হাতে। উপকরণ ও সম্পদহীনতার কারণে উন্মুক্ত জলাভূমিতে (সাগর) মাছ ধরারও যে অধিকার তা এসব সাধারণ মানুষের হাত থেকে গুটিকয়েক ব্যবসায়ী, ধনী প্রভাবশালীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

সম্পদের মালিকানাভিত্তিক বিভাজন

ক্রমিক	সম্পদ	শতকরা হার
১	বসতবাড়ি	৬৮%
২	কৃষিজমি	৩২%
৩	মাছ ধরার জাল	৪%
৪	নৌকা	১%

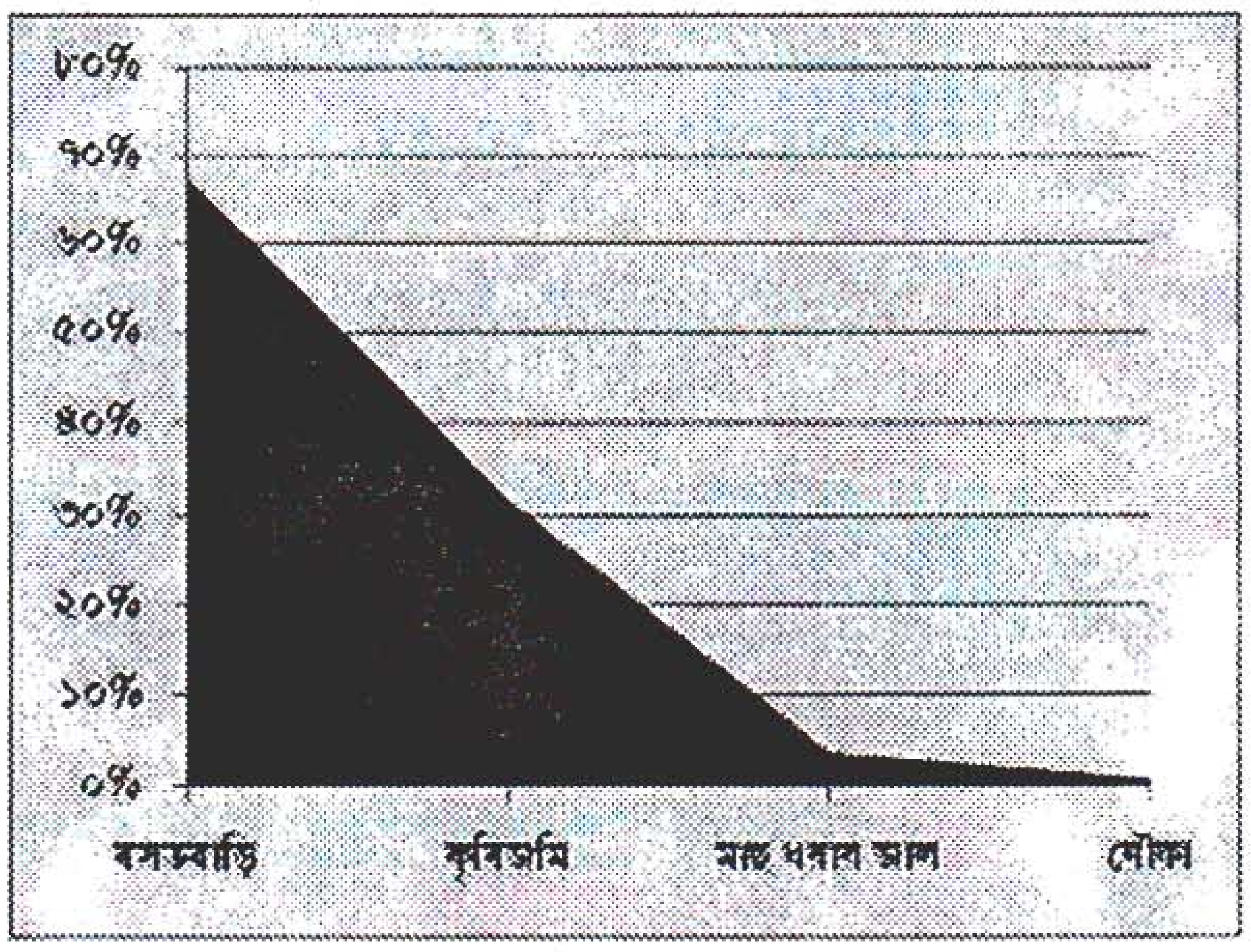

সম্পদ বিভাজনের এই চক্রজালে পড়ে এবং সাধারণ সম্পদের ওপর থেকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব হারিয়ে সাধারণ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ ক্রমাগত নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। এদের জন্যে নেই কোন সামাজিক সহায়তা কার্যক্রম। যার সহায়তায় তারা টিকে থাকতে পারে। উপায়হীন এই মানুষের জীবন-জীবিকার জন্যে একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়াচ্ছে শ্রম বিক্রি করা। সাগরে মাছ ধরার প্রধান উপকরণ নৌকার মালিকানা গুটিকয়েক সম্পদশালীর হাতে নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য, এটি ঠিক যে, নৌকার মালিকানা শুধুমাত্র সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের ধনী গুটিকয়েক মানুষ নয়, এই মালিকানা উপজেলা-টেকনাফবাসী তথা জেলা-কক্সবাজার, এমনকি চট্টগ্রামের ধনী-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে।

নৌকার মালিকানা

ক্রমিক	নৌকা মালিকদের অবস্থান	শতকরা হার
১	সেন্ট মার্টিনস্স্ দ্বীপ	৪৩%
২	টেকনাফ	২৬%
৩	কক্সবাজার	১৮%
৪	চট্টগ্রাম	৫%
৫	অন্যান্য	৮%

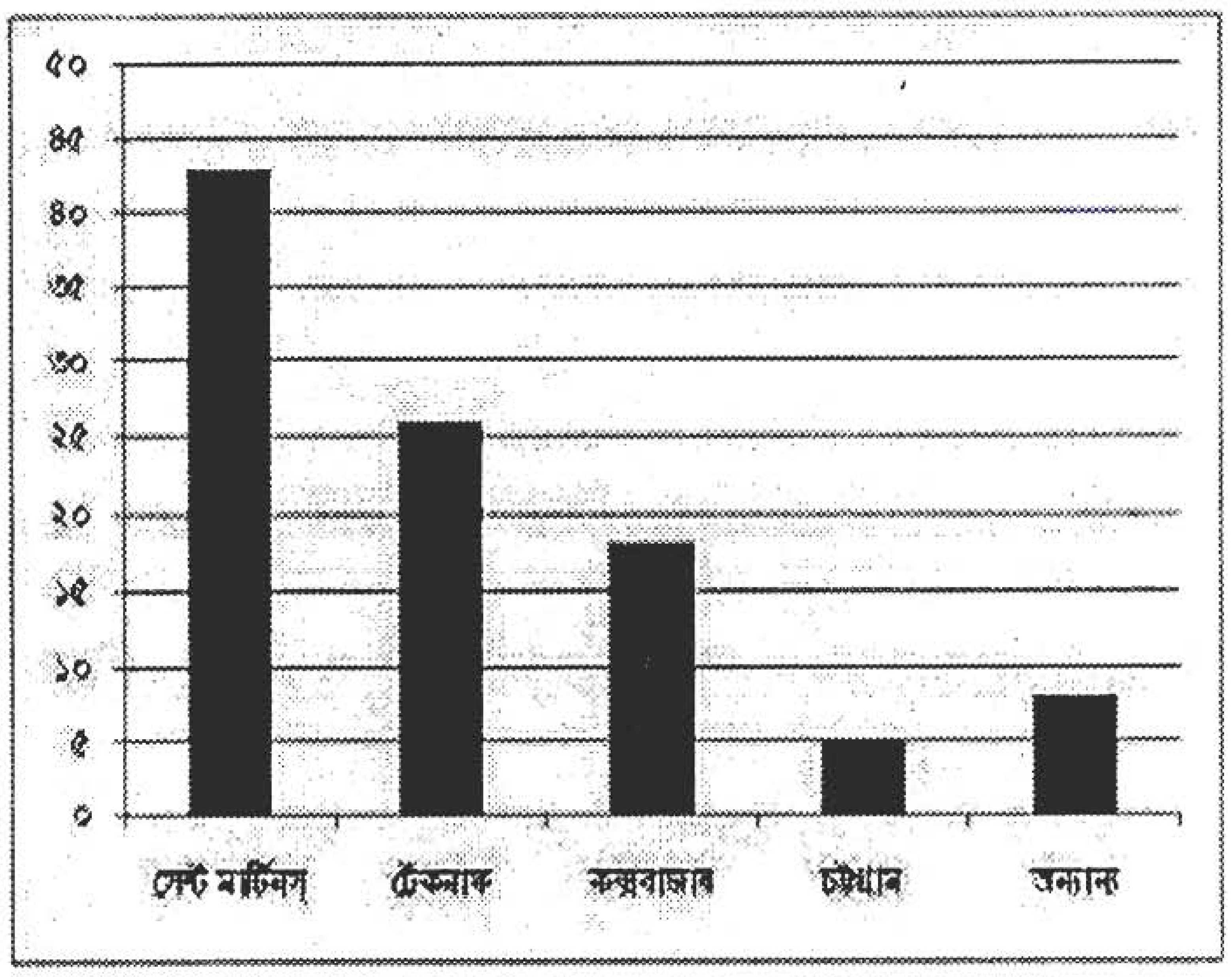

স্বাস্থ্য

এই দ্বীপবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্যে দশ শয্যার একটি হাসপাতাল রয়েছে; তবে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাস্থ্যসেবা সেভাবে পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভালো চিকিৎসক কেউই থাকেন না বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ। গুরুতর কোন রোগের চিকিৎসার জন্যে সমুদ্র এবং নাফ নদী পাড়ি দিয়ে টেকনাফ সদরে যেতে হয়। সুপেয় পানির সংকট রয়েছে। নলকূপে পানি ওঠে, তবে সুস্বাদু নয়। এনজিওদের সুবাদে প্রায়-প্রতিটি বাড়িতে সেনিটেশন সুবিধা থাকলেও তা যথার্থ স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

শিক্ষা

এই দ্বীপে একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় আছে। সেখানে ৮১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এখানকার এসএসসি পরীক্ষার্থীদের টেকনাফে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা দু'টি এবং মাদ্রাসা রয়েছে পাঁচটি। সার্বিকভাবে দ্বীপের নতুন প্রজন্মের লেখাপড়ার তেমন কোন

সুযোগ নেই। আর যেহেতু দ্বীপবাসী গরীব সেকারণে দেশের মূল ভূ-খণ্ডে এসে লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্য তাদের নেই। এখানকার শিশুদের উল্লেখযোগ্য অংশ শামুক-ঝিনুক সংগ্রহ করে।

বিনোদন

এককথায় দ্বীপে বিনোদনের কোন সুযোগ নেই। পর্যটন মওসুমে নানান মানুষের আগমন এখানকার মানুষের একধরনের বিনোদন।

নিরাপত্তা

দ্বীপবাসীর নিরাপত্তার জন্যে সাম্প্রতিককালে এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসেছে। টেকনাফ থানার অধীন এই পুলিশ ফাঁড়িটি কাজ করে।

আধুনিক ব্যবসা

প্রাকৃতিকভাবে অতীব আকর্ষণীয় এই দ্বীপটির মূল আকর্ষণ সৈকতজুড়ে প্রবাল পাথরের মেলা এবং সারি সারি নারিকেল গাছ। পর্যটন মওসুমে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক এখানে আসেন। বঙ্গোপসাগরের গভীর পানির নিচ থেকে উঠে আসা শত কোটি বছর আগেকার এই দ্বীপটি তাই ব্যবসায়ীদের নজরে এসেছে। দিনে দিনে এখানে গড়ে উঠছে স্থাপনা–হোটেল, মোটেল, রেস্ট হাউজ আরও কতকিছু।

পর্যটন মওসুমে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপে পাঁচটি বড় জাহাজ চলাচল করে। এগুলো হচ্ছে–কেয়ারী সিন্দাবাদ, ঈগল, রিগক্রুজ, এলসিটি কুতবদিয়া ও রাঙ্গাবালী। ভরা পর্যটন মওসুমে প্রতিটি জাহাজে গড়ে প্রতিদিন এক হাজার পর্যটক সেখানে হাজির হয়।

এই হিসেবে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ সেখানে যায়। এর অধিকাংশ ওইদিনই ফিরে আসে। আর বাকিরা সেখানেই রাত কাটান। অনেকেই দিনে দিনে চলে আসেন। এসব সৌন্দর্যপিপাসুরা যেমন দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন, তেমনি নিজের অজান্তেই বেশ কতকগুলো ক্ষতিকর কাজের অনুঘটক হিসেবে আবির্ভূত হন। যেমন স্বল্প সময়ের জন্যে আসা পর্যটকদের ব্যবহৃত প্লাস্টিকে তৈরি পানির বোতল, খাবার সামগ্রী নেওয়ার বিভিন্ন উপকরণ প্রভৃতি যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখেন। সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে, ক্ষণস্থায়ী পর্যটকদের পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। যেকারণে তারা যেখানে-সেখানে এই প্রাকৃতিক ক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন। এমনকি সেখানে যেসব হোটেল-মোটেল গড়ে উঠেছে, সেখানেও পয়ঃনিষ্কাশনের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। উন্মুক্ত স্থান, সমুদ্র, ঝোঁপ-ঝাড় প্রভৃতি স্থান মানুষ প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সম্পন্নের স্থান হিসেবে ব্যবহার করায় প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে উঠছে।

জীবন-জীবিকার হুমকি

জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী ধ্বংস হতে চলেছে। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, স্বাদু পানির সংকট, অতিরিক্ত টাইডাল সার্জ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রধান। আর দ্বীপের বাসিন্দা ও বাণিজ্যিক হস্তক্ষেপে চলছে অপরিণামদর্শী মৎস্য আহরণ, পানি দূষণ, মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ ও পাথর সংগ্রহ, প্রবাল সংগ্রহ, বালিয়ারি কেয়াবন, প্যারাবন ও ঝোপঝাড় ধ্বংস হচ্ছে।

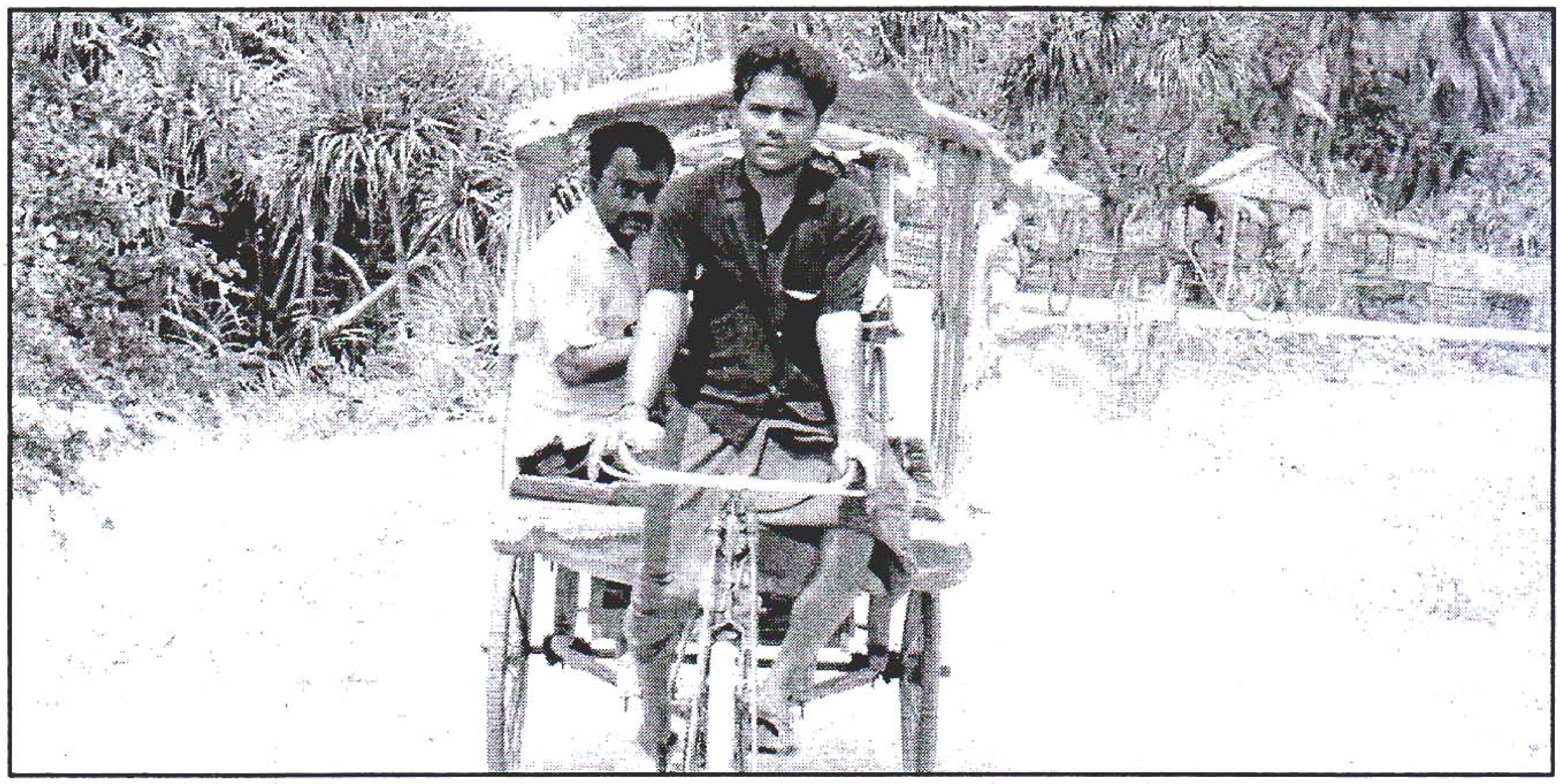

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে দ্বীপের কাছিম, লাল কাঁকড়াসহ অসংখ্য জীবকুল প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে। তাছাড়া সমুদ্র সৈকতে মানুষের অবাধ বিচরণ, বিভিন্ন প্রাণীর অবৈধ আহরণ,

অপরিকল্পিতভাবে যেখানে-সেখানে নোঙর করা হচ্ছে, যা এই বিশেষ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অঞ্চলটির সঙ্গে সাযুজ্য নয়।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর বাংলাদেশের তাপমাত্রা দশমিক ১৬৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস করে বাড়ছে। আন্তঃদেশীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত (আইপিসিসি) রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, চলতি শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৯ থেকে ৮৮ সেমি বাড়বে। আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র ৪৫ সেমি বাড়লেই অনন্য জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের ৭২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ডুবে যাবে। পাশাপাশি বিস্তীর্ণ এলাকার বেশিরভাগ বৃক্ষ ও প্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বেড়ে ওঠা প্রাণিকুল তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে টিকে থাকতে পারবে না। এমনকি তাপমাত্রায় স্পর্শকাতর উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের বৃদ্ধি ও প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যে কারণে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর আলোকে সেন্ট মার্টিনস্‌স্ দ্বীপকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা Ecologically Critical Area–ECA ঘোষণা করেছে।

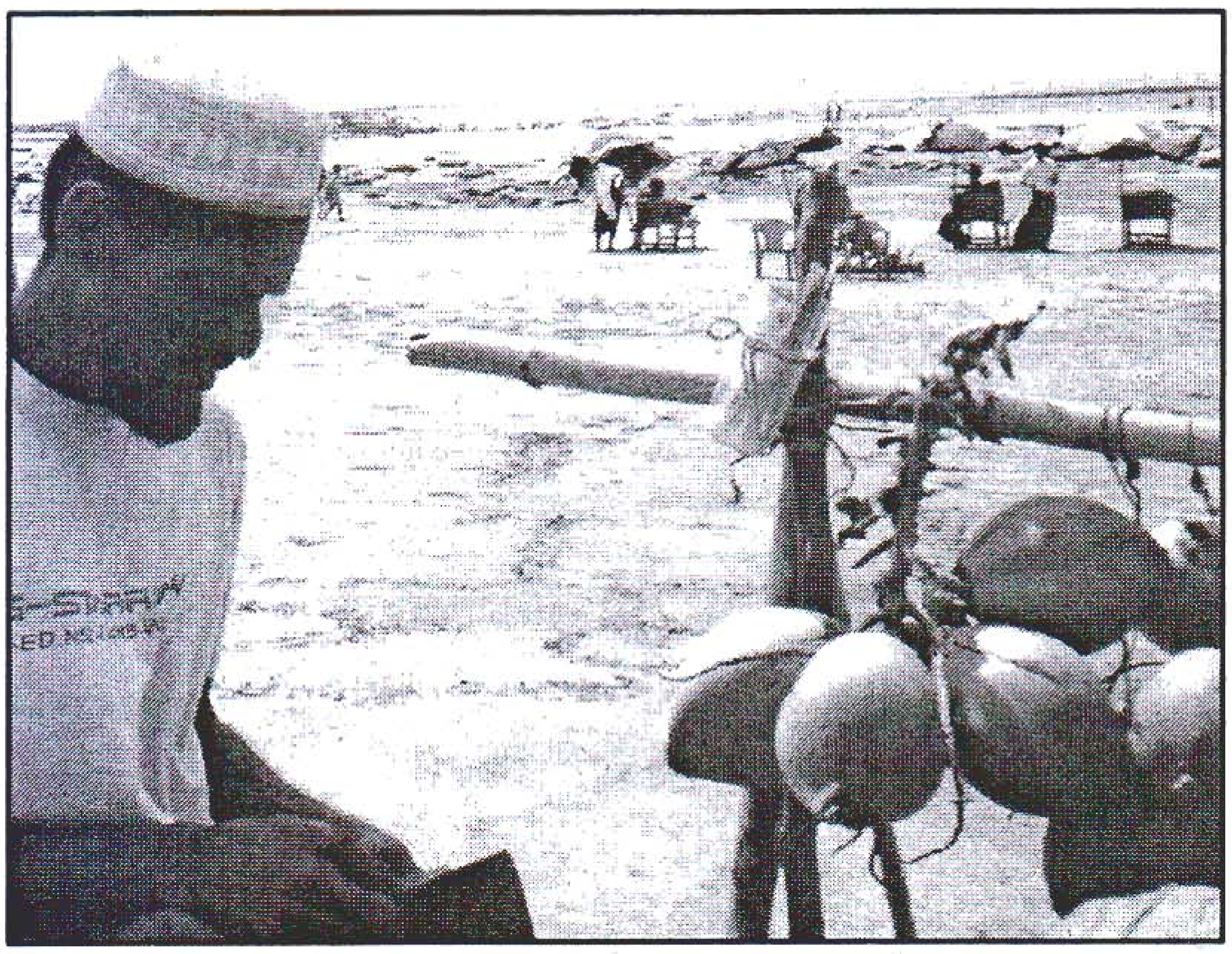

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বেশ পড়তে শুরু করেছে বলে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছেন। ২০০৭-এর ১৫ নবেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর এরই নমুনা বলে অনেকেই উল্লেখ করেন। ২০০৮ সালে আগের তুলনায় অনেক বেশিবার ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ছিল। ওই বছরের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের উল্লেখযোগ্য সময়জুড়ে ছিল সাগর উত্তাল। এই তিনমাসে আটবার ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেখানো হয়। যাতে দ্বীপবাসীরা এক মানসিক কষ্টে দিন কাটাতে বাধ্য হয়।

ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসে সবচেয়ে বিপদে পড়েন সমুদ্রে মৎস্য আহরণকারী জেলেরা। যারা সমুদ্রে দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসেন; তাঁদের যন্ত্রণা-কষ্ট এক ধরনের, তাঁরা যে ক'দিন যেতে পারেন না, সেই ক'দিন তাঁদের আয় হয় না। আয় না হওয়া মানে সঞ্চয় ভেঙে অথবা দেনা করে খাওয়া। এভাবে বেশিদিন চললে আর সঞ্চয় না থাকলে ধার করতে হয়। সাধারণতঃ ধার পাওয়া যায় না। আর ধার পাওয়া গেলেও উচ্চ হারে সুদ দিতে হয়। এর ফল হিসেবে অনেককেই না খেয়ে কাটাতে হয়। একই পরিণতি হয়, যারা সমুদ্রে বেশ কয়েকদিন বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মাছ ধরতে যান, তাঁদের ক্ষেত্রেও। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ তাঁদের জীবন-ধারণের জন্যে বর্তমানে বিরাট এক বাধা।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত হলেও এবং সরকারি উদ্যোগে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলেও এখনও দ্বীপে আগত পর্যটকরা প্রবালের ভিত কেটে প্রবাল পাথর সংগ্রহ করছেন। সংগৃহীত হচ্ছে শামুক-ঝিনুক। আবার কেউ কেউ শখের বশেও প্রবাল ভাঙছেন। ব্যবহার্য পানির বোতল, খাবারের প্যাকেটসহ অপচনশীল দ্রব্যসামগ্রীও ফেলা হচ্ছে যেখানে-সেখানে। এতে সংকটের মুখে পড়ছে জীবন্ত প্রবাল, রঙিন মাছ, নানা ধরনের শৈবাল, শামুক, কাঁকড়াসহ সামুদ্রিক জীবের আবাসস্থল।

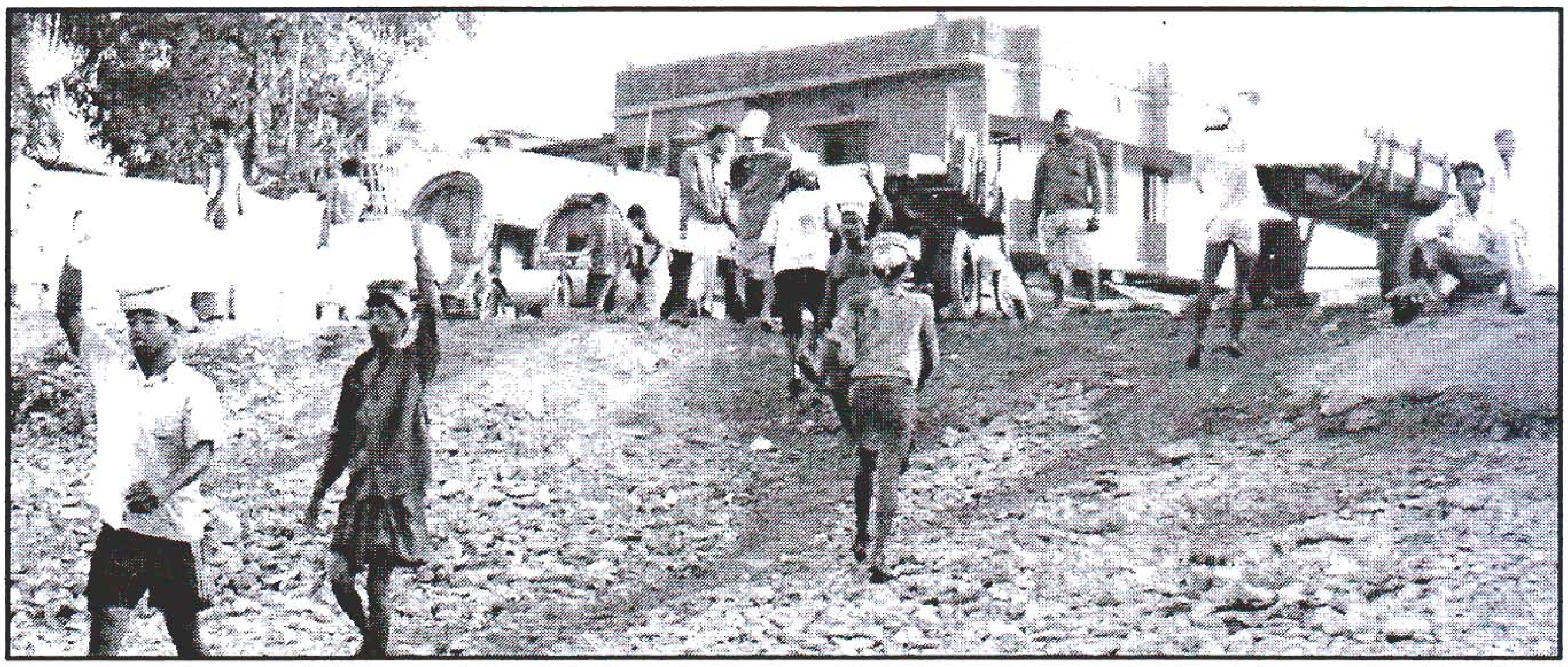

দ্বীপে তৈরি করা হোটেল-মোটেল-বাংলোগুলো দ্বীপটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্যে খুবই বিপজ্জনক। ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, প্রবাল পাথরের কাঠামো ভেঙে স্থাপনা নির্মাণ করায় দ্বীপটির প্রবাল ভিত্তির ওপর আঘাত লাগছে। আর এমন কোন জরিপ বা তথ্য-প্রমাণ আমাদের কাছে নেই যে, এই প্রবাল-ভিত্তিটি বা প্রবালের ওপর পতিত হওয়া পলি বা বালুরাশির ফলে সৃষ্ট মাটির স্তর কতটা পুরু বা শক্তিশালী। যেহেতু প্রবাল সেকারণে এটি মাটির মত শক্ত আধার নয়, প্রবালের মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা থাকে–যা ফাঁপা বা

পানিতে পূর্ণ থাকে। প্রবালের ওপর একারণে ভারী স্থাপনা খুবই বিপজ্জনক। অতিরিক্তি চাপে প্রবাল ভেঙে, ধ্বসে বা ডুবে যাতে পারে। এমন ঘটনা ঘটলে গোটা দ্বীপটির অস্তিত্ব মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

মৎস্য আহরণ মওসুমে শুধুমাত্র দ্বীপবাসীরা নয়, আশেপাশের এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্য আহরণকারী এই দ্বীপের আশেপাশে অস্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তোলে। এলাকাবাসীদের তথ্যমতে, মওসুমভিত্তিক এই মাছ শিকারীদের সংখ্যা হবে দশ হাজারের মত। সাম্প্রতিককালে বেশ ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস থাকায় মৎস্য শিকারীরা সমুদ্র থেকে নিরাপদ স্থানে চলে আসতে বাধ্য হয়। মাছ শিকারীরা তখন সেন্ট মার্টিনস্‌কেই নিরাপদ ঠাঁই হিসেবে বেছে নেয়, যা বেশ বিপজ্জনক। এছাড়াও জেলেরা সমুদ্রে মানুষরূপী দানবের হামলার শিকার হয় প্রায়শঃই। এই দানবদের একটি গ্রুপ ডাকাতবেশে জেলেদের সর্বস্ব লুটে নেয়। আবার সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যরাও জেলেদের ওপর হামলে পড়ে উৎকোচ হিসেবে নগদ টাকা এবং মাছ আদায় করে।

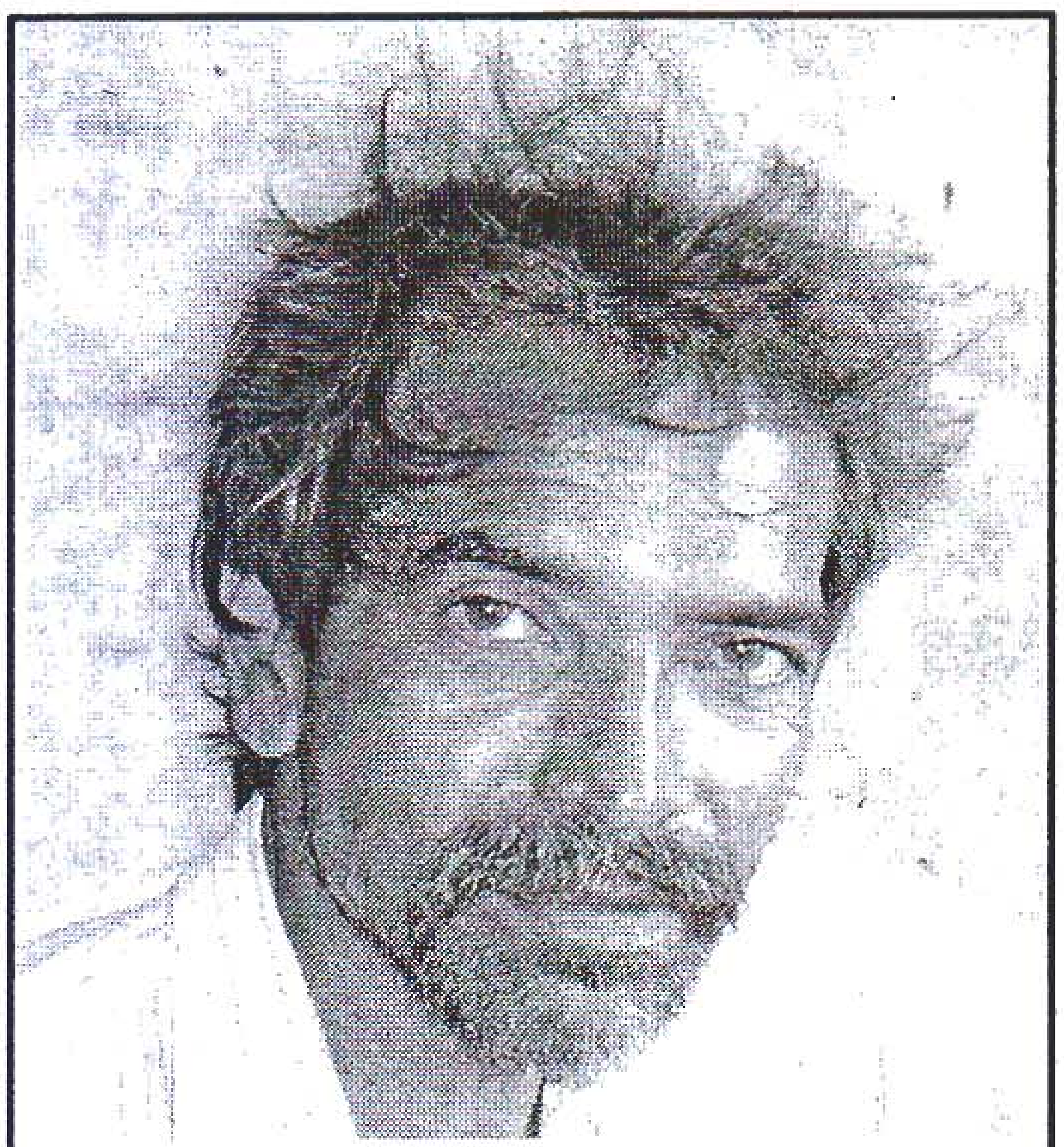

হুমকির মুখে পড়েছে হংসধর জলদাশদের মতো সমুদ্রগামী জেলেদের জীবন-জীবিকা

দ্বীপবাসীদের বাজারে প্রবেশাধিকার বা অধিগম্যতা

দ্বীপবাসীদের বাজারে একেবারেই প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। দ্বীপের প্রধান পেশাজীবী গোষ্ঠী জেলেরা বলতে গেলে একেবারে বন্ডেড শ্রমিক। এই জেলে-শ্রমিকদের পাওনার টাকা হিসাব করা হয়, প্রাপ্ত মাছ বিক্রির অর্থ থেকে। মাছ বিক্রি করেন সাধারণতঃ ট্রলার মালিক। তিনি বিক্রির টাকা যা হিসাব করেন, সেই হিসাবে জেলে-শ্রমিকরা ভাগ পেয়ে থাকেন। এতে ট্রলার ও জালের মালিক শ্রমিকদের ঠকানোর

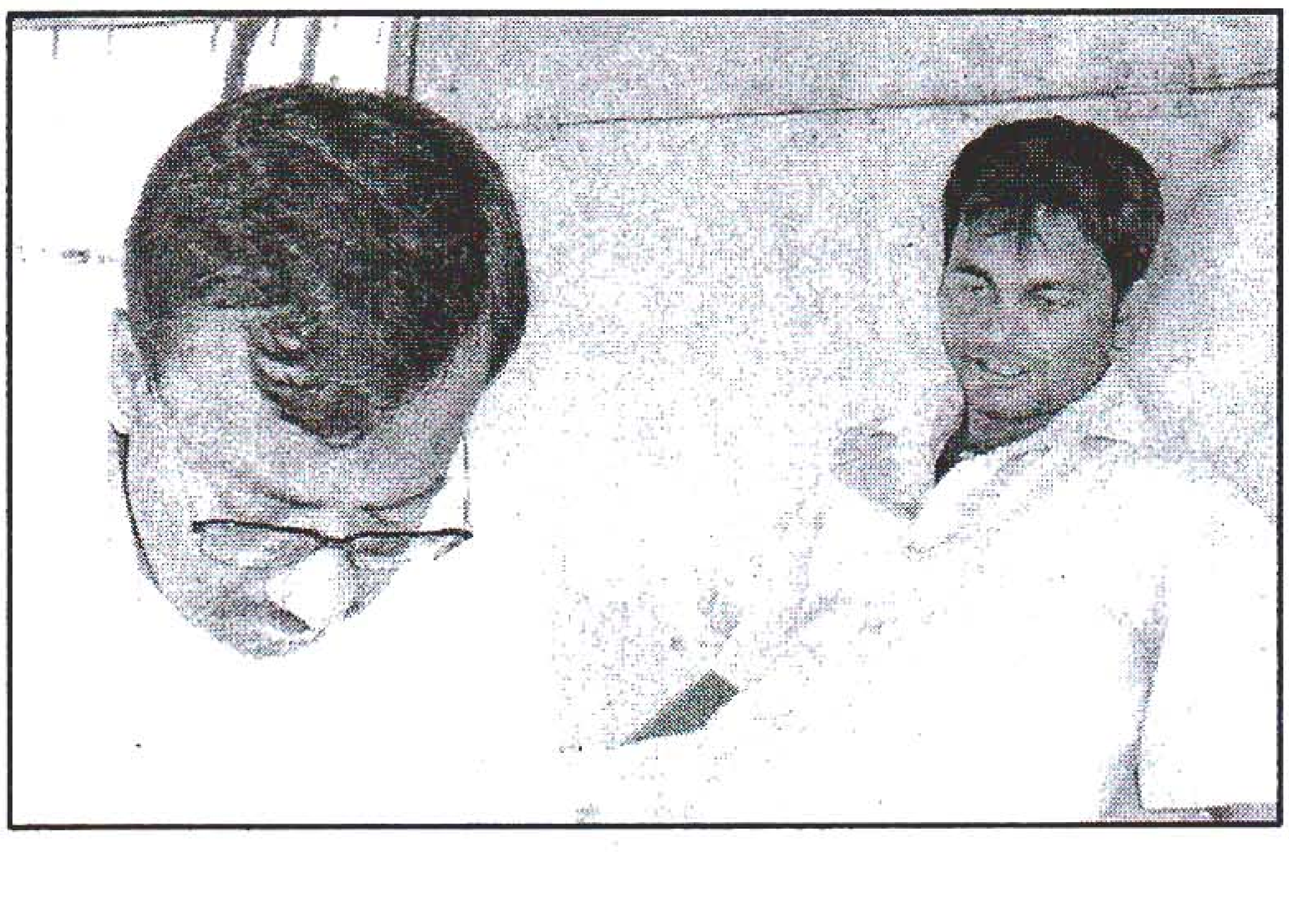

সুযোগ পান। জেলে-শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত ঠকেও থাকে। উৎপাদিত কৃষি-পণ্যের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিপত্তি ঘটে থাকে। ঠিক একইভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার জন্যেও তাদেরকে দ্বীপের গুটিকয়েক ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যথায় সাগর পাড়ি দিয়ে দেশের মূল ভূ-খণ্ড টেকনাফে যেতে হয়। যা সময় ও অর্থব্যয়সাপেক্ষ।

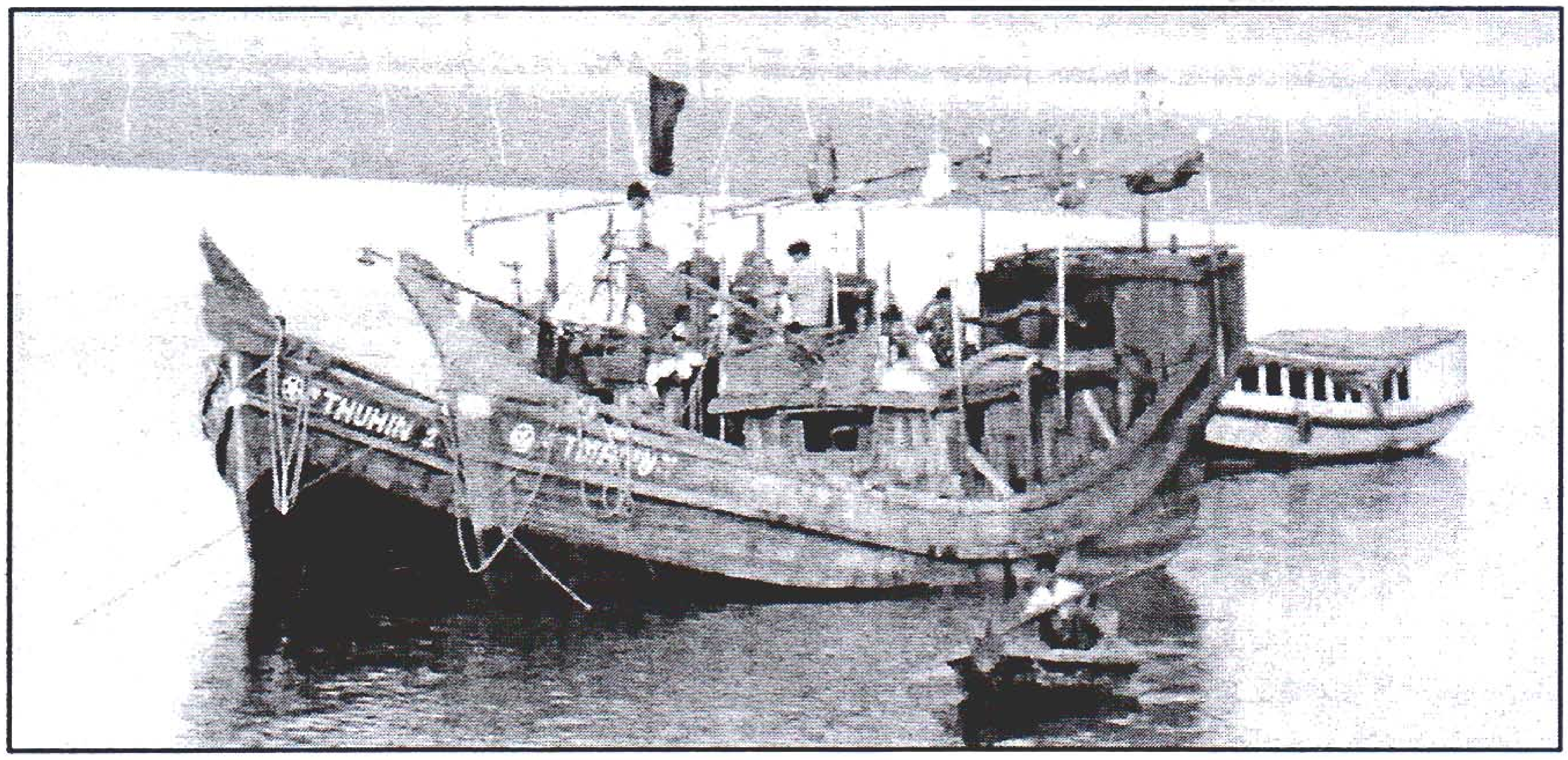

দ্বীপের সমস্যাবলী কি সাধারণের সমস্যা?

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের সমস্যাগুলোকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি :

- দ্বীপবাসীরা এখন সেখানকার সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছে। সম্পদের মালিকানা যাচ্ছে বহিরাগত ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের কাছে।
- ব্যবসায়ীদের থাবায় দ্বীপবাসীরা জমি হারিয়ে ভূমিহীন শ্রমজীবীতে পরিণত হচ্ছে। বহিরাগত ব্যবসায়ীরা হচ্ছে পরাক্রমশালী দাপুটে, আর দ্বীপবাসীরা অভাবী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।
- দ্বীপের কৃষি কর্মকাণ্ডগুলো ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে।
- দ্বীপকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার ব্যক্তি উদ্যোগ যথেষ্ঠ পরিমাণে বাড়ছে। যেকারণে বিশাল বিশাল স্থাপনা গড়ে উঠছে।
- দ্বীপটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সরকারি কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নেই।
- দ্বীপে পানীয়-জলসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে।

- দ্বীপে এখনও স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটেশন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।
- দ্বীপটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আরও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপের সমস্যাটি কি সাধারণের সমস্যা? প্রকৃতপক্ষে সমস্যাগুলো দ্বীপের অধিকাংশ মানুষের সমস্যা এবং জীবন-জীবিকার সমস্যা। ফলে বিষয়টি বিচ্ছিন্নভাবে ভাবার সুযোগ নেই। একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এলাকা হিসেবে এই সমস্যাগুলো সাধারণের সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।

প্রচারণা কর্মসূচির ভূমিকা

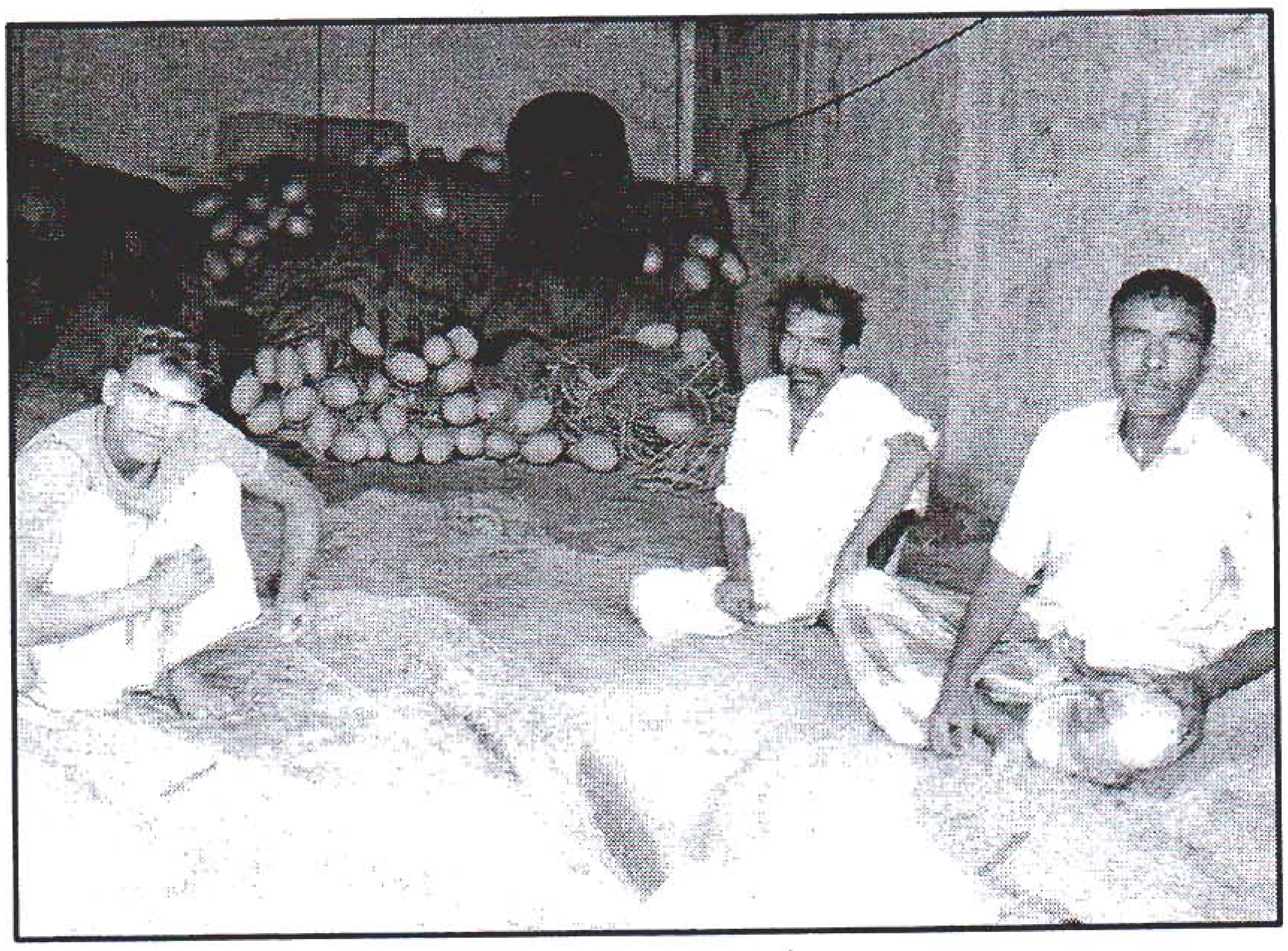

গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্যে প্রচারণা কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপকূলীয় এলাকা গ্রুপের ইস্যূ হচ্ছে : সাধারণ সম্পদে প্রবেশাধিকার দাও। যদিও এই সাধারণ ইস্যুটির সঙ্গে এই বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কৃষি-অঞ্চলের সাযুজ্য খুবই কম রয়েছে; তারপরও আমরা উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্যে এই মুহূর্তে যা করতে পারি তা হচ্ছে :

- দ্বীপটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্যে সকল স্তরে জনমত গড়ে তোলা ও নীতি-নির্ধারকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- বেসরকারি উদ্যোগে ইচ্ছেমত স্থাপনা তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ও তা বলবৎ করার জন্যে প্রয়োজনীয় নীতি তৈরি করার জন্যে সংশ্লিষ্টদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা।
- সম্পদের ওপর দ্বীপবাসীদের দখল বজায় রাখতে তাদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তার জন্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- দ্বীপবাসী মানুষের প্রাকৃতিক তথা সাধারণ সম্পদঃ যেমন সমুদ্রে মাছ ধরার অধিকার বজায় রাখার জন্যে তাদেরকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া।

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে দ্বীপবাসীকে রক্ষা ও তাদের আয় নিশ্চিত করার জন্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

শেষের কথা

প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের ভূ-সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির হলেও প্রতিবেশগত বিবেচনায় এটি রাষ্ট্রের বা সাধারণের সম্পত্তি। প্রতিবেশগত বিবেচনায় এটিকে রক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তির ইচ্ছার খেয়াল-খুশিমত ব্যবহার করা বন্ধ করা উচিত। ছোট্ট এই প্রাকৃতিক সম্পদ-নির্ভর কৃষি প্রতিবেশ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাসজমি রয়েছে, যা ইতিমধ্যে প্রভাবশালীদের কর্তৃত্বে-নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। অথচ সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী, খাসজমির প্রধান এবং প্রকৃত দাবিদার ভূমিহীনরা। ওখানকার ভূমিহীনদের মাঝে এই খাসজমি বরাদ্দ দিলেও তাদের আয়ের সংস্থান হতে পারে। কিন্তু প্রভাবশালী মহল তা দখল করেছে। □

তথ্যপঞ্জী

প্রাথমিক উৎস

১. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

- আব্দুস সালাম (৫০), নারিকেল বিক্রেতা;
- বছির আহমেদ (২৫), রিক্সা-ভ্যান চালক;
- আব্দুল হাকিম (৪৫), ট্রলার মালিক;
- হংসধর জলদাশ (৬৫), সমুদ্রে মাছ আহরণকারী;
- পরাণ জলদাশ (৩৫), সমুদ্রে মাছ আহরণকারী;
- মো: হানিফ (৪০) মাছ আহরণকারী:
- জাফরউল্লাহ (৬০), এনজিও কর্মকর্তা;
- আফছারউদ্দিন (৪৭), এনজিও কর্মকর্তা;

২. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন–এফজিডি

- এনায়েতউল্লাহ, আব্দুল হাকিম, আব্দুস সালাম, রহিমা বেগম, আমেনা খাতুন, রহিম বাদশা, হাসান, আকবর আলী, জাহিদুর রহমান, সোলেমান, সদরউদ্দিন ও গণি মিয়া (সেন্ট মার্টিনস্স পূর্ব পাড়া)
- রহিমউল্লাহ, ময়েজউদ্দিন, সলেমান, সালাম, রউফ, নেয়ামতউল্লাহ, আফছারউদ্দিন, রশিদউদ্দিন, খোকন মাঝি, আকবর আলী, জুলেখা, হুমায়ূন, মুকিত ও মাসুম শেখ (সেন্ট মার্টিনস্স্ সমুদ্র সৈকত)
- মহিবুল্লাহ, শমসের আলী, রশিদ শেখ, আনোয়ার হোসেন, সফি মাঝি, রোকন মাঝি, বাদশা, রউফ মাঝি, আবিদউল্লাহ, নবী হোসেন, (সেন্ট মার্টিনস্ সমুদ্র সৈকত)

মাধ্যমিক উৎস

১. Report on Zoning Maps of St. Martin's Island ECA; Bangladesh POUSH and PRATTAYA; October 2007.

২. Resource Inventory and Mapping St. Martin's Island ECA; Bangladesh POUSH and PRATTAYA; October 2007.

উত্তরণ
বাড়ি # ২০৫, সড়ক # ০৮
সোনাডাঙা আবাসিক এলাকা, খুলনা-৯১০০
uttaran@bdonline.com
gouranga.nandy@gmail.com